আল আদিয়াত

১০০

নামকরণ

প্রথম শব্দ আল আদিয়াতকে (اَلْعٰدِيٰتِ) এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির মক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), জাবের (রা), হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও কাতাদাহ একে মাদানী সূরা বলেন। অন্যদিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দুই ধরনের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটি মত হচ্ছে এটি মক্কী সূরা এবং অন্য একটি বক্তব্যে তিনি একে মাদানী সূরা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরার বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি কেবল মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী যুগেরও প্রথম দিকে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মানুষ আখেরাতকে অস্বীকার করে অথবা তা থেকে গাফেল হয়ে কেমন নৈতিক অধপাতে যায় একথা লোকদের বুঝানোই এই সূরাটির উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে আখেরাতে কেবল মানুষের বাইরের কাজকর্মই নয়, তাদের মনের গোপন কথাগুলোও যাচাই-বাছাই করা হবে, এ সম্পর্কেও এই সূরায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে আরবে সাধারণভাবে যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে ছিল এবং যার ফলে সমগ্র দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সারা দেশের চতুর্দিকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছিল। লুন্ঠন, রাহাজানী, এক গোত্রের ওপর অন্য গোত্রের আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। রাতে কোন ব্যক্তিও নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারতো না। কারণ সবসময় আশংকা থাকতো, এই বুঝি কোন দুশমন অতি প্রত্যুষে তাদের জনপদ আক্রমণ করে বসলো। দেশের এই অবস্থার কথা আরবের সবাই জানতো। তারা এর ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিল। যার সবকিছু লুন্ঠিত হতো, সে এ অবস্থার জন্য মাতম করতো এবং যে লুন্ঠন করতো সে আনন্দে উৎফুল্ল হতো। কিন্তু এই লুন্ঠনকারী আবার যখন লুন্ঠিত হতো, তখন সেও অনুভব করতো, এ কেমন খারাপ অবস্থার মধ্যে কেমন দুর্বিসহ জীবন আমরা যাপন করে চলেছি।

এ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং সেখানে আল্লাহর সামনে জবাদিহি করার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। সে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাগুলোকে জুলুম–নিপীড়নের কাজে ব্যবহার করছে। সে ধন–সম্পদের প্রেমে অন্ধ হয়ে তা অর্জন করার জন্য যে কোন অন্যায়, অসৎ ও গর্হিত পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। তা অবস্থা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে, সে নিজের রবের দেয়া শক্তিগুলোর অপব্যবহার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাহীনতার প্রকাশ করছে। যদি সে সেই সময়ের কথা জানতো যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে আবার উঠতে হবে এবং যেসব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও স্বার্থপ্রবণাতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে দুনিয়ায় নানান ধরনের কাজ করেছিল সেগুলোকে তার মনের গভীর তলদেশ থেকে বের করে এনে সামনে রেখে দেয়া হবে, তাহলে সে এই দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি কখনই অবলম্বন করতে পারতো না। দুনিয়ায় কে কি করে এসেছে এবং কার সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা উচিত মানুষের রব সে সময় সেকথা খুব ভালোভাবেই জানবেন।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾
فَأَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾
وَإِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾

কসম সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা হ্রেষারব সহকারে দৌড়ায়।[১] তারপর (খুরের আঘাতে) আগুনের ফুলকি ঝরায়।[২] তারপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে।[৩] তারপর এ সময় ধূলা উড়ায় এবং এ অবস্থায় কোন জনপদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আসলে মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।[৪] আর সে নিজেই এর সাক্ষী।[৫] অবশ্য সে ধন-দৌলতের মোহে খুব বেশী মত্ত।[৬]

১. দৌড়ায় শব্দের মাধ্যমে যে এখানে ঘোড়া বুঝানো হয়েছে আয়াতের শব্দগুলো থেকে একথা মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং এখানে শুধু বলা হয়েছে وَالْعٰدِيٰتِ অর্থাৎ "কসম তাদের যারা দৌড়ায়।" এ কারণে কারা দৌড়ায় এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। সাহাবী ও তাবেঈগণের একটি দল বলেছেন, ঘোড়া এবং অন্য একটি দল বলেছেন উট। কিন্তু যেহেতু দৌড়াবার সময় বিশেষ আওয়াজ, যাকে ضَبْح (হ্রেষারব) বলা হয়, একমাত্র ঘোড়ার মুখ দিয়েই দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলার কারণে বের হয় এবং পরের আয়াতগুলোতে অগ্নি স্ফুলিংগ ঝরাবার, খুব সকালে কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার এবং সেখানে ধূলা উড়াবার কথা বলা হয়েছে, আর এগুলো একমাত্র ঘোড়ার সাথেই খাপ খায়, তাই অধিকাংশ গবেষক একে ঘোড়ার সাথেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। ইবনে জারীর বলেন, "এ ব্যাপারে যে দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায় তার মধ্যে ঘোড়া দৌড়ায় এই বক্তব্যটি অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। কারণ উট হ্রেষারব করে না, ঘোড়া হ্রেষারব করে। আর আল্লাহ বলেছেন, যারা হ্রেষারব করে দৌড়ায় তাদের কসম।" ইমাম রাজী বলেন, "এই আয়াতগুলোর বিভিন্ন শব্দ চিৎকার করে চলছে, এখানে ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ ঘোড়া ছাড়া আর কেউ হ্রেষারব করে না। আর আগুনের স্ফুলিংগ ঝরাবার কাজটিও পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের আঘাতেই সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই তা হতে পারে না। অন্য দিকে খুব সকালে আক্রমণ চালাবার কাজটিও অন্য কোন প্রাণীর তুলনায় ঘোড়ার সাহায্যে সম্পন্ন করাই সহজতর হয়।"

২. আগুনের ফুলকি ঝরায় ইত্যাকার শব্দগুলো একথাই প্রকাশ করে যে, রাত্রিকালে ঘোড়া দৌড়ায়। কারণ তাদের পায়ের খুর থেকে যে আগুনের ফুলকি ঝরে তা রাতের বেলায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

৩. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ করতে হলে তারা রাতের আঁধারে বের হয়ে পড়তো। এর ফলে শত্রুপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্ক হতে পারতো না। এভাবে একেবারে খুব সকালে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রভাতে আলো যেটুকু ছড়িয়ে পড়তো তাতে তারা সবকিছু দেখতে পেতো। আবার দিনের আলো খুব বেশী উজ্জ্বল না হবার কারণে প্রতিপক্ষ দূর থেকে তাদের আগমন দেখতে পেতো না। ফলে তারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারতো না।

৪. রাতের বেলা হ্রেষারব করে আগুনের ফুলকি ঝরাতে ঝরাতে যেসব ঘোড়া দৌড়ায়, তারপর খুব সকালে ধূলি উড়িয়ে কোন জনপদে চড়াও হয় এবং প্রতিরোধকারীদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেসব ঘোড়ার কসম খাওয়া হয়েছে যে কথাটি বলার জন্য এটিই সেই কথা। অধিকাংশ তফসীরকার এই ঘোড়া বলতে যে ঘোড়া বুঝিয়েছেন তা দেখে অবাক হতে হয়। জিহাদকারী গাযীদের ঘোড়াকে তারা এই ঘোড়া বলে চিহ্নিত করেছেন এবং যে ভীড়ের মধ্যে এই ঘোড়া প্রবেশ করে তাকে তারা কাফেরদের সমাবেশ মনে করেছেন। অথচ "মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ" এ কথাটির ওপরই কসম খাওয়া হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাযীদের ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি এবং কাফেরদের কোন দলের ওপর তাদের ঝাঁপিয়ে পড়ায় একথা বুঝায় না যে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর মানুষ নিজেই তার এই অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী এবং সে ধন-দৌলতের মোহে বিপুলভাবে আক্রান্ত—এই পরবর্তী বাক্যগুলোও এমন সব লোকদের সাথে খাপ খায় না যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হয়। তাই নিশ্চিতভাবে একথা মেনে নিতে হবে যে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে যে কসম খাওয়া হয়েছে তা সে সময়ের আরবে সাধারণভাবে যে লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত চলছিল সেদিকেই ইংগিত করছে। জাহেলী যুগে রাতগুলো হতো বড়ই ভয়াবহ। প্রত্যেক গোত্র ও জনপদের লোকেরা আশংকা করতো, না জানি রাতের আঁধারে তাদের ওপর কোন দুশমন চড়াও হবার জন্য ছুটে আসছে। আর দিনের আলো প্রকাশিত হবার সাথে সাথে তারা নিশ্চিন্ত হতো। কারণ রাতটা নির্ঝনঝাটে ও ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। সেখানে গোত্রে গোত্রে কেবলমাত্র প্রতিশোধমূলক লড়াই হতো না। বরং এক গোত্র আর এক গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতো তার ধন-দৌলত লুটে নেবার, তার উট, ভেড়া ইত্যাদি পশু কেড়ে নেবার এবং তার মেয়েদের ও শিশুদের গোলাম বানাবার জন্য। এসব লুটতরাজ ও জুলুম নিপীড়ন করা হতো সাধারণত ঘোড়ায় চড়ে। মানুষ যে তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ এই বক্তব্যের সপক্ষে এ বিষয়গুলোকে আল্লাহ প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। অর্থাৎ যে শক্তিকে তারা ব্যয় করছে লুটতরাজ, হানাহানি, খুন-খারাবি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য সে শক্তি তো আল্লাহ তাদেরকে মূলত এ কাজে ব্যয় করার জন্য দেননি। কাজেই আল্লাহর দেয়া এ উপকরণ ও শক্তিগুলোকে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী অপ্রিয় যে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা তার পিছনে ব্যয় করা তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١

তবে কি সে সেই সময়ের কথা জানে না যখন কবরের মধ্যে যা কিছু (দাফন করা) আছে সেসব বের করে আনা হবে[৭] এবং বুকের মধ্যে যা কিছু (লুকানো) আছে সব বের করে এনে যাচাই করা হবে?[৮] অবশ্য সেদিন তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত থাকবেন।[৯]

৫. অর্থাৎ তার বিবেক এর সাক্ষী। আবার অনেক কাফের নিজ মুখেই প্রকাশ্যে এই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ তাদের মতে আদতে আল্লাহর কোন অস্তিত্বই নেই। সে ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতি তাঁর কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অপরিহার্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৬. কুরআনের মূল শব্দগুলো হচ্ছে : وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে, "সে ভালোর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।" কিন্তু আরবী ভাষায় 'খাইর' শব্দটি কেবলমাত্র ভালো ও নেকীর প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না বরং ধন–দৌলত অর্থেও এর ব্যবহার প্রচলিত। সূরা আল বাকারার ১৮০ আয়াতে "খাইর" শব্দটি ধন–সম্পদ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে কোথায় এ শব্দটি নেকী অর্থে এবং কোথায় ধন–সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তা অনুধাবন করা যায়। এই আয়াতটির পূর্বাপর আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে, এখানে "খাইর" বলতে ধন–সম্পদ বুঝানো হয়েছে, নেকী বুঝানো হয়নি। কারণ যে ব্যক্তি নিজের রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের অকৃতজ্ঞতার সপক্ষে সাক্ষ পেশ করছে তার ব্যাপারে কখনো একথা বলা যেতে পারে না যে, সে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।

৭. অর্থাৎ মরা মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাকে বের করে এনে জীবিত মানুষের আকারে দাঁড় করানো হবে।

৮. অর্থাৎ বুকের মধ্যে যেমন ইচ্ছা ও নিয়ত, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য, চিন্তা, ভাবধারা এবং বাহ্যিক কাজের পেছনে যেসব গোপন অভিপ্রায় (Motives) লুকিয়ে আছে সেসব খুলে সামনে রেখে দেয়া হবে। সেগুলো যাচাই বাছাই করে ভালো ও খারাপগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেয়া হবে। অন্য কথায় শুধুমাত্র বাইরের চেহারা দেখে মানুষ বাস্তবে যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়া হবে না। বরং মনের মধ্যে লুকানো রহস্যগুলোকে বাইরে বের করে এনে দেখা হবে যে, মানুষ যেসব কাজ করেছে তার পেছনে কি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ–প্রেরণা লুকিয়েছিল। এ বিষয়টি চিন্তা করলে মানুষ একথা স্বীকার না করে পারে না যে, আসল ও পূর্ণাংগ ইনসাফ একমাত্র আল্লাহর আদালত ছাড়া আর কোথাও কায়েম হতে পারে না। নিছক বাইরের কাজকর্ম দেখে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যায় না বরং কি উদ্দেশ্যে সে এ কাজ করেছে তাও দেখতে হবে। দুনিয়ার ধর্মহীন

আইন ব্যবস্থাগুলোও নীতিগতভাবে একথা জরুরী মনে করে। তবে নিয়ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তার সঠিক চেহারা সনাক্ত করার মতো উপকরণ দুনিয়ার কোন আদালতেরও নেই। একমাত্র আল্লাহই এ কাজ করতে পারেন। একমাত্র তিনিই মানুষের প্রত্যেকটি কাজের বাইরের চেহারার পেছনে যে গোপন প্রেরণা ও উদ্দীপনা সক্রিয় থাকে তা যাচাই করে সে কোন্ ধরনের পুরস্কার বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে তা নির্ধারণ করতে পারেন। তাছাড়া আয়াতের শব্দাবলী থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, মনের ভেতরে, ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বাহ্নেই যে জ্ঞান রাখেন নিছক তার ভিত্তিতে এ ফায়সালা হবে না। বরং কিয়ামতের দিন এ রহস্যগুলো উন্মুক্ত করে সবার সামনে রেখে দেয়া হবে এবং প্রকাশ্য আদালতে যাচাই ও পর্যালোচনা করে এর কতটুকু ভালো ও কতটুকু খারাপ ছিল তা দেখিয়ে দেয়া হবে। এজন্য এখানে حُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ বলা হয়েছে। কোন জিনিসকে বের করে বাইরে নিয়ে আসাকে 'হুসসিলা' বা 'তাহসীল' বলে। যেমন, বাইরের ছাল বা খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের মগজ বের করা। এভাবে বিভিন্ন ধরনের জিনিসকে ছেটে পরস্পর থেকে আলাদা করার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই মনের মধ্যে লুকানো রহস্যসমূহের 'তাহসীল' বা বের করে আনার মধ্যে এ দু'টি অর্থই শামিল হবে। সেগুলোকে খুলে বাইরে বের করে দেয়াও হবে আবার সেগুলো ছেটে ভালো ও মন্দ আলাদা করে দেয়াও হবে। এ বক্তব্যটিই সূরা আত তারিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ "যেদিন গোপন রহস্য যাচাই বাছাই করা হবে।" (৯ আয়াত)।

৯. অর্থাৎ কে কি এবং কে কোন্ ধরনের শাস্তি বা পুরস্কারের অধিকারী তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানবেন।